পুষ্টিকর খাবার: সুস্থ জাতি গঠনে সহায়ক

সেলিনা আক্তার

জীবন ধারনের জন্য যেমন খাদ্য অত্যাবশ্যক আবার সুস্থভাবে বেঁচে থাকার জন্য নিরাপদ পুষ্টিমান সম্পন্ন ও সুষম খাবার গ্রহণ প্রয়োজন। দেশ আজ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বেড়েছে , কমেছে দারিদ্র্যতা। তারপরও জনসংখ্যার একটা বিরাট অংশ পুষ্টিহীনতায় ভুগছে । সুস্থ ও কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী তৈরিতে পুষ্টিহীনতা মারাত্মক চ্যালেঞ্জ , যা খাদ্য নিরাপত্তার সাথে জড়িত । একসময় খাদ্য নিরাপত্তার অর্থ ছিল জনসংখ্যা অনুপাতে যথেষ্ঠ পরিমাণ খাদ্য মজুদ থাকা । খাদ্য নিরাপত্তা হলো দেশের সব মানুষের জন্য নিরাপদ, পুষ্টিকর, পছন্দমাফিক ও প্রয়োজনীয় খাবার যথেষ্ঠ পরিমাণে প্রাপ্তির নিশ্চয়তা। অর্থাৎ স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সুবিধার নিশ্চয়তা। আর সেই জন্যে আমাদেরকে খাদ্যশস্য আর প্রাণিজ আমিষ উৎপাদনে আরো মনযোগী হতে হবে। পুষ্টিকর খাবারের পাশাপাশি নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করতে হবে। তবেই আমরা স্বাস্থ্যবান জাতি হিসেবে বিশ্বে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবো।

রাষ্ট্র সাংবিধানিকভাবে জনগণের পুষ্টি ও জনজীবনের উন্নতি সাধনে অঙ্গীকারাবদ্ধ (সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৮) খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা তখনই সম্ভব হয়, যখন সকল সময়ে সকল জনগণের শারীরিক প্রয়োজন ও উপযোগিতা মেটাতে পর্যাপ্ত পরিমাণে স্বাস্থ্যসম্মত, নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ভৌত অবকাঠামোর সুফল প্রাপ্তির সুযোগ বাজায় থাকে এবং সেগুলো স্বাস্থ্যসম্মত ও সক্রিয় জীবনযাপনের অনুকূল নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন এবং স্বাস্থ্য ও সেবা প্রদানের সহায়ক একটি সেবা ব্যবস্থা ও পরিবেশ দ্বারা সমর্থিত হয়।

আমাদের খাদ্য গ্রহণের মূল উদ্দেশ্য হলো সুস্থ সবল ও কার্যক্রম হয়ে বেঁচে থাকা। যে কোনো খাবার খেয়ে পেট ভারানো যায় কিন্তু তাতে দেহের চাহিদা মিটিয়ে সুস্থ থাকা যায় না। কাজেই প্রকৃত খাদ্য ও পুষ্টি সম্বন্ধে আমাদের প্রত্যেকেরই ধারণা থাকা দরকার। পুষ্টি জ্ঞানের অভাবে সুষম খাদ্য গ্রহণের প্রতি আমরা মোটেই সচেতন নই। তাতে যারা পেট ভরে দুই বেলা খেতে পায় না তারাই যে শুধু পুষ্টিহীনতায় ভুগছে তা নয়, সে সঙ্গে ধনীরা ও অপুষ্টির শিকার থেকে অব্যাহতি প্রাপ্ত নন।

পুষ্টিহীনতা তথা নিরাপদ খাদ্যের অনিশ্চয়তা টেকসই উন্নয়নের অন্তরায় । বাংলাদেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করলেও দেশের সব মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তির অনিশ্চয়তা প্রধান বাধা । চারপাশে ভেজাল আর বিষাক্ত খাদ্যের দাপটে মানুষ আক্রান্ত হচ্ছে নানা ধরনের ঘাতক ব্যাধিতে। এমনকি শিশুদের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হচ্ছে।

আমাদের পুষ্টিহীনতার পিছনে জীবনাচরণ অন্যতম বিষয় । এক্ষেত্রে সচেতনতার অভাব রয়েছে । এখনো আমাদের খাদ্য তালিকায় শষ্যজাতীয় খাবারের প্রাধান্য রয়েছে। অথচ খাবারে ভিটামিন এ , জিঙ্ক ও আয়রনের ঘাটতিতে বাড়ছে রক্তস্বল্পতা , অন্ধত্ব এবং সংক্রামক রোগ, শিশুর স্বাভাবিক বিকাশ ব্যহত হচ্ছে, ঝুঁকিতে থাকছে অন্তঃস্বত্বা নারী। পুষ্টিহীনতা রোধে বয়স অনুযায়ী সঠিক খাবার যথাযথ পরিমাণে থাকাটা জরুরি বিষয়। ভ্রূনাবস্থা থেকে পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুকে সুষম পুষ্টিকর খাবার দিতে হবে । কারণ এ সময়েই শিশু বিকাশের সব শর্ত তৈরি হয়ে যায়। শৈশব, কৈশোর ও বয়ঃসন্ধিকালের সঠিক বৃদ্ধি এবং পরবর্তীতে সুস্থ জীবনযাপনের জন্য যথাযথ মাত্রায় পুষ্টিকর খাবার প্রয়োজন । কিন্তু পর্যাপ্ত খাবারের নিশ্চয়তা থাকা সত্ত্বেও অনেকেই এসব বিষয় ভাবেনা । সঠিক পরিকল্পনার অভাবে অনেকেই সন্তানদের জন্য সঠিক খাবার নির্বাচন না করে ফাস্টফুড এবং বাজারের অস্বাস্থ্যকর খাবার কিনে আনেন। অথচ আজকের কিশোরী কিংবা তরুণীরাই আগামী দিনে সন্তানের মা । তাদের পুষ্টির ওপরই নির্ভর করে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সুস্বাস্থ্য।

কৃষিতে বাংলাদেশের অভূতপূর্ব উন্নতি চোখে পড়ার মতো । সে হিসেবে খাদ্যের উৎপাদন ও মজুদ জনসংখ্যানুপাতে আশাব্যঞ্জক। খাদ্য সংকটের কথাও মানুষ ভুলতে বসেছে । আশার কথা সম্প্রতি বাংলাদেশ পুষ্টি পরিস্থিতির ক্ষেত্রে অগ্রগতির দিকে ধাবিত হচ্ছে পুষ্টিহীনতার প্রবণতা ক্ষুধা পর্যবেক্ষণে ব্যবহৃত সূচকের হার ১৯৯৯-২০০১ সময়ে গড়ে ২০ দশমিক ৮ থেকে হ্রাস পেয়ে ২০১৭-১৯ সময়ে গড়ে ১৩তে উপনীত হয়েছে। একইভাবে ২০০৪ সালের তুলনায় ২০১৯ সালে পাঁচ বছরের কম বয়সি শিশুদের মধ্যে খর্বতার হার ৫১ শতাংশ থেকে কমে ২৮ শতাংশ এবং কৃশকায়তায় শতকরা ১৫ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ৯ দশমিক ৮ শতাংশ এবং কম ওজনের শিশুর হার ৪৩ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ২২ দশমিক ৬ শতাংশ হয়েছে। এসডিজি'র দ্বিতীয় লক্ষ্য হলো সব মানুষের জন্য বিশেষ করে দরিদ্র ও ক্ষুধার ঝুঁকিতে থাকা মানুষ এবং শিশুদের জন্য সারা বছর নিরাপদ , পুষ্টিকর এবং পর্যাপ্ত খাদ্য নিশ্চিত করা। এছাড়া ২০২৫ সালের মধ্যে অনূর্ধ্ব ৫ বছর শিশুদের শারীরিক বৃদ্ধি এবং মানসিক বিকাশের অন্তরায়সমূহ দূর করা এবং বয়ঃসন্ধিকালের মেয়েদের, গর্ভবতী মায়েদের, দুগ্ধদানকারী মায়েদের এবং সব বয়স্ক মানুষের পুষ্টির প্রয়োজন অনুযায়ী সব ধরনের অপুষ্টি দূর করা।

মানবদেহের পুষ্টি চাহিদা পূরণে শাকসবজির ভূমিকা অনস্বীকার্য। বিশেষ করে বিভিন্ন প্রকারের ভিটামিন ও খনিজ লবণের উৎস হিসেবে স্বল্প খরচে বছরব্যাপী এর জোগান দিতে সবজি ফসলের কোনো বিকল্প নেই। আর এসব খাদ্য উপাদান অল্প প্রয়োজন হলেও তা শরীর গঠন ও বুদ্ধি বৃত্তির বিকাশে অত্যাবশ্যকীয়। সবজির জগতে বৈচিত্র্যময় বহু ফসলের সমাহার এবং বছরব্যাপী চাষাবাদ ও প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা গেলে শুধু পুষ্টির নিরাপত্তা বিধান করা যাবে তাই নয়, এসব পুষ্টির অভাবজনিত বিভিন্ন রোগের হাত থেকেও জাতিকে মুক্ত রাখা যাবে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু এ বিষয়টি বেশ ভালোভাবেই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তিনি অনুধাবন করতে পেরেছিলেন পুষ্টিহীন জাতি মেধাশূন্য আর মেধাশূন্য জাতি যেকোনো দেশের জন্য বিরাট বোঝা, তাই ১৯৭৩ সালে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি মানুষের পুষ্টিমান উন্নয়নে বাংলাদেশ ন্যাশনাল নিউট্রিশন কাউন্সিল (বিএনএনসি) গঠন করেছিলেন। মাঝপথে এর কার্যক্রম বন্ধ হয়ে গেলেও মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের শক্তি সরকার গঠন করার পর প্রধানমন্ত্রী তা আবার পুনরুজ্জীবিত করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 'জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতি ২০২০' প্রণয়ন করেন। যার মধ্যে বলা হয়েছে বাংলাদেশের সকল মানুষ সুস্থ ও কর্মক্ষম জীবন যাপনের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা অর্জন করবে। আর তাই জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতির লক্ষ্য হলো খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা সম্পর্কিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা অবস্থার উন্নতি করা এবং ২০৩০ সালের মধ্যে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সকল জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতি পূরণ করা।

সঠিক পুষ্টির মাধ্যমে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে । দেহের ক্ষয়পূরণ, পুষ্টি সাধন এবং দেহকে সুস্থ ও নিরোগ রাখার জন্য নানা ধরনের ফল-সবজি অতি প্রয়োজনীয় খাদ্য। এগুলো ছাড়া আমাদের সুষম খাদ্যের কথা চিন্তা করা যায় না। খাদ্য বিজ্ঞানীরা একজন প্রাপ্ত বয়স্কের জন্য প্রতিদিন ৪০০ গ্রাম ফল সবজি খাবার পরামর্শ দেন। এর মধ্যে শাকপাতা ১১০ গ্রাম, ফুল ফল-ডাঁটা জাতীয় সবজি ৮৫ গ্রাম, মূল জাতীয় ৮৫ গ্রাম ও ফল ১১০ গ্রাম ধরা হয়েছে। ফল সবজি পুষ্টিতে সমৃদ্ধ হলেও সংরক্ষণ খাবার পরিবেশন ও ত্রুটিপূর্ণ রান্নার কারণে এসব খাবারের প্রকৃত গুণাগুণ থেকে আমরা বঞ্চিত হয়ে থাকি। তাজা অবস্থায় ফল সবজি খেলে তাতে খাদ্যমান বেশি পাওয়া যায়। প্রায় সব রকম ফলে যথেষ্ট পরিমাণ ভিটামিন-সি পাওয়া যায়। শাকসবজিতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ভিটামিন-সি থাকে তবে রান্না করার সময় তাপে প্রায় ৮০% ভিটামিন 'সি' নষ্ট হয়ে যায়। কাজেই সালাদ হিসেবে শাকসবজি খেলে ভিটামিন-সিসহ আরো কিছু উপাদানের (ভিটামিন ও মিনারেলস) পুরো ফায়দা পাওয়া যায়। তবে যাদের সবজি কাঁচা খেলে হজমে সমস্যা হতে পারে তাদের হালকা সিদ্ধ করে খাওয়াই উত্তম। আপেল, নাশপাতি, পেয়ারা শসা ইত্যাদি ধরনের ফলের ছিলকা বা ওপরের খোসা আমরা অনেকেই ফেলে দেই। তাতে অনেক খাদ্যমান অপচয় হয়। ফল সবজি উভয় ক্ষেত্রে সম্ভব হলে খোসা না ফেলাই ভালো। বেশি পাকা ফলে খাদ্যমান কমে যায়। যেমন পাকা পেঁপে থেকে আধাপাকা পেঁপে বেশি পুষ্টিমান সম্পন্ন। তাছাড়া পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার দিকে বেশি নজর দেওয়া প্রয়োজন। ফল সবজি আগেই ভালোভাবে ধুয়ে কাটা উচিত। আগে কেটে পরে ধোয়া হলে পানির সাথে অনেক খাদ্য উপাদান/ভিটামিন মিশে বের হয়ে যায়। সবজি কাটার আগে হাত, বাসন ও বঁটি ভালোভাবে ধুয়ে নেয়া প্রয়োজন। সবজি কুটি কুটি করে কাটলে পুষ্টিমানের অপচয় হয়। তাই তরকারির টুকরোগুলো বড়ো রাখা প্রয়োজন। অনেকের ধারণা বেশি তেল মসলা দিলে রান্না ভালো হয়। অথচ কম তেল-মসলা ও কম সিদ্ধ স্বাস্থ্যের জন্য ভালো।

আমাদের কৃষি উন্নয়নকে স্থায়ী করতে এবং খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে খাদ্য অপচয় রোধে দরকার সমন্বিত ব্যবস্থাপনা। ফল ও সবজির পচন রোধে দরকার পর্যাপ্ত সংরক্ষনাগার । প্রান্তিক ও মধ্যম চাষী এবং উৎপাদনকারীদের জন্য তাদের উৎপাদিত ফল ও সবজি সংরক্ষণে পর্যাপ্ত হিমাগার স্থাপন করাসহ এসব প্রক্রিয়াজাত ও বাজারজাতকরণে সরকার ও অর্থলগ্নিকারী প্রতিষ্ঠানদেরকে এগিয়ে আসতে হবে। শুধু তাই না পারিবারিকভাবে বিবেচনায় আনতে হবে খাদ্য অপচয় অত্যন্ত গর্হিত কাজ।

সুস্বাস্থ্যর অধিকারী স্বাভাবিক উচ্চতা সম্পন্ন তরুণ প্রজন্ম আগামী দিনের মানবসম্পদ । এজন্য ঘরে ঘরে গড়ে তুলতে হবে গণসচেতনতা। এছাড়া খাদ্য নিরাপত্তায় সাফল্য অর্জন সম্ভব না। দরিদ্র পরিবারে পুষ্টিমানসমৃদ্ধ বিকল্প খাবার এবং স্বচ্ছল পরিবারে ঘরে তৈরি পুষ্টিকর খাবার বাড়ন্ত শিশুর বিকাশে , শৈশব ও তারুণ্যে কিভাবে ভূমিকা রাখে এটা জানতে হবে মায়েদের । নারীরা বিশেষত মায়েরা সচেতন হলে পারিবারিক অভ্যাস গড়ে ওঠবে। অতিরিক্ত তেল, চিনি, লবণ সুস্বাস্থ্যের অন্তরায়। সরকার সুষম খাবার, খাদ্য ও পুষ্টি বিষয়ে যে জোর দিয়েছে তা বাস্তবায়ন সম্ভব একমাত্র সাধারণ জনগণকে সচেতন করার মাধ্যমে। জাতীয় গণমাধ্যমগুলো সাধারণ জনগণের মধ্যে পুষ্টি বিষয়ক এই তথ্যসমূহ যথাযথ প্রচারের মাধ্যমে সঠিক যোগাযোগের একটি সেতুবন্ধন তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

খাদ্য উৎপাদন ও পুষ্টির ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনার বিচক্ষণ নেতৃত্বে বাংলাদেশের সাম্প্রতিক যে অগ্রগতি হয়েছে তা এসডিজির লক্ষ্যমাত্রা এবং ভিশন ২০৪১-এর অভীষ্ট অর্জনে সহায়ক হবে। এটাই হোক আমাদের সকলের প্রত্যাশা।

#

১২.১১.২০২০ পিআইডি ফিচার